

ওরিয়ানা ফাল্লাচি: মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমাপ্তি অ ব নি অ ন া র্ য

শুধু জীবনের গল্প শুনতে এবং শোনাতে ভালোবাসতেন তিনি। মৃত্যুকে ঘেন্না করতেন, মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। জীবনের শেষের দিকে মরণব্যাপি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন তিনি। চিকিৎসকদের মুখেও মৃত্যুর পূর্বাভাস পেলে তিনি ক্ষেপে যেতেন, বলতেন— আমি জীবনের কথা শুনতে এসেছি উষ্টির, মরণের কথা নয়।

ঠিকই, নিজের মৃত্যুর কথা তাঁকে শুনতে হয়নি। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাস করলেও নিজের জন্মশহর ফ্লোরেন্সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ইতালির বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক, লেখক ওরিয়ানা ফাল্লাচি। প্রায় পনেরো বছরেরও বেশি সময়কাল স্তন ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন সাংবাদিকতা জগতের এই কিংবদন্তী। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬, মাত্র সাতাত্তর বছর বয়সে চলে গেলেন তাঁর বইয়ের মলাটের পেছনে। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা এমনই ছিলো।

ছোটবেলায় লাইব্রেরিতে পড়ার অভিজ্ঞতায় এমনটাই বলেছিলেন, লেখকরা কখনো মরে না, লুকিয়ে থাকে মলাটের পেছনে।

১৯২৯ সালের ২৯ জুলাই, ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাবা এডেরাডো ফাল্লাচি ছিলেন আসবাবপত্র নির্মাতা। প্রচণ্ড রাজনীতি সচেতন এডেরাডো, ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির বিরোধিতা করে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির সঙ্গে যোগ দেন। মেয়ে ওরিয়ানা ফাল্লাচিও যোগ দেয় বাবার সঙ্গে, সদস্য হয় আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক দল *কর্পস অব ভলান্টিয়ারস ফর দ্য ফ্রিডম গ্রুপে*। নাৎসিবিরোধী আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ওরিয়ানার বাবা ধরা পড়ে জেল খাটেন, অমানুষিক নির্বাতন চালানো হয় তাঁর উপর। এ-প্রসঙ্গে ওরিয়ানার মা টোসকা ফাল্লাচির অসম্ভব দুঃসাহসিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায় ওরিয়ানা ফাল্লাচির নিজের জবানীতে। যে ঘরে ওরিয়ানার বাবা এবং অন্যান্য আরো আরো বন্দিদের উপর নির্বাতন চালানো হতো এবং শেষে হয়তো খুন করা হতো, সেটার নাম ছিলো *ভিলা ট্রিসটি*। সেটার দায়িত্বে ছিলো ফ্যাসিস্ট মেজর ক্যারিটি (মারিও কার্টিয়া)। দুদিন অনেক জায়গা খুঁজে শেষমেশ মা টোসকা জানতে পারলেন, তাঁর স্বামীকে এই ঘরে বন্দি করে নির্বাতন চালানো হচ্ছে। সোজা চলে গেলেন সেখানে। প্রবেশপথেই দেখতে পেলেন রক্তাক্ত একটি কামরা, তিনজন বন্দিকে বেঁধে রাখা হয়েছে— তাদের মধ্যে একজন ওরিয়ানার বাবা। মেজর ক্যারিটির কক্ষে প্রবেশ করলেন টোসকা। অর মেজর বললেন— আমার কিছু করার নেই। তোমার স্বামীকে কাল সকাল ছটায় মেরে ফেলা হবে। কালো পোষাক পরার জন্য প্রস্তুত হও। ওরিয়ানার মা-ও দমে যাবার পাত্র নন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ওরিয়ানার ভাষায় তাঁকে তখন স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো দেখাচ্ছিলো। তিনিও হুংকার দিলেন— শোনো, মারিও কার্টিয়া, তোমার কথা মতো কাল সকালে আমি ঠিকই কালো পোষাক পরবো। তুমিও জেনে রাখো, তোমার জন্ম যদি কোনো মায়ের গর্ভে হয়, তবে তাকেও বোলো কালো পোষাক পরতে। কারণ, তোমার সময়ও ফুরিয়ে আসছে। বেরিয়ে এলেন মা টোসকা, সঙ্গে ওরিয়ানা। টোসকার গর্ভে তখন আরো একটি সন্তান বড় হচ্ছে। তবু ওরিয়ানাকে নিয়ে নিজেই সাইকেল চালিয়ে ফিরছিলেন। পথে তীব্র বেদনা শুরু হলো। সাইকেল থামিয়ে ঢুকে পড়লেন একটা বাড়িতে। ঢোকার পথেই গর্ভপাত হলো। রুমালমতো একটা কিছুতে নাড়িছেঁড়া অপূর্ণ সন্তানটিকে মুড়িয়ে ফিরলেন বাড়িতে। বাড়ির দরজা খুললেন ওরিয়ানা। ততক্ষণে মা'র শরীর শাদা হয়ে গেছে। বাড়িতে ঢোকার আগেই বললেন, শোনো তোমার বাবাকে কাল সকাল ছটায় মেরে ফেলা হবে। আর এলিনা (সদ্যমৃত, গর্ভে বেড়ে ওঠা বাচ্চাটার নাম এই নাম রেখেছিলেন টোসকা) মারা গেছে। চোখ অশ্রুহীন।

ওরিয়ানার বাবাকে অবশ্য শেষমেশ মেরে ফেলা হয়নি, তবে তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে দীর্ঘদিন। ওরিয়ানার দু'বোন— নিরা আর পাওলা। নিরা লেখালেখি করতেন; ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন।

যুদ্ধের তাগুনের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন বলেই হয়তো যুদ্ধ এবং ক্ষমতার সমালোচনা করেছেন আজীবন। তাঁর নিজের উক্তি— স্বৈরশাসকের কাছ থেকেই হোক, আর নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের কাছ থেকেই হোক, খুনী জেনারেলের কাছ থেকেই হোক, আর মহান নেতার কাছ থেকেই হোক, ক্ষমতা মাত্রই হিংসাত্মক এবং অমানবিক প্রক্রিয়া। নিজে তিনি দেখেছেন অনেক যুদ্ধ, ইতালির নিজের অভিজ্ঞতাও সেরকম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে ইতালি নিরব থাকলেও পরে যুক্তরাষ্ট্র-গ্রেট ব্রিটেন-ফ্রান্স অক্ষের সঙ্গে যোগ দেয় ইতালি। আদ্রিয়াটিক সাগরের উপকূলের বিস্তীর্ণ জায়গা দেবার লোভ দেখানো হয়েছিলো ইতালিকে। বড় আশা নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হতাশ হয় ইতালি। প্রায় ছয় লক্ষ লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে ইতালির নিজের সীমানা রক্ষাই দায় হয়ে দাঁড়ায়। বিস্তীর্ণ উপকূলের পরিবর্তে ইতালির অর্জন কেবলমাত্র ট্রেনটিনো-আলটো-অ্যাডিজ-ট্রিসটি অঞ্চলটুকু। যুদ্ধ শেষে দেশের ভেতর দেখা দেয় চরম অর্থনৈতিক অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা, শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে, বেকার সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে, তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, যুদ্ধ কেবলমাত্র উচ্চবিত্তের অর্থবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। আর এ সুযোগে রাজনৈতিক মেরুকরণও ঘটে। দিশেহারা শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ পুঁজি করে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট বাহিনী গঠিত হয়। ফ্যাসিস্ট

মতবাদের সঙ্গে যুক্ত হয় নব্য জাতীয়তাবাদ। শ্রেণী সংঘাতের সমাধান স্থানীয় সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির প্রেক্ষিতে বিবেচনা না করে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তথা শাসকশ্রেণীর একক ক্ষমতায়নের মধ্যেই নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯২১ সালে এরই ভিত্তিতে গঠিত হয় মুসোলিনির ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি। বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের আস্থা অর্জনেও সমর্থ হয় দলটি। বছর চার-পাঁচেকের মধ্যেই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয় মুসোলিনি। শেষ পর্যন্ত হিটলারের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় মুসোলিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সময়ের মধ্য দিয়ে বড় হন ওরিয়ানা ফাল্লাচি।

ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরেন্সের চিকিৎসাবিদ্যা অনুষদে ভর্তি হন ওরিয়ানা। কোর্স সমাপ্ত না করেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন লেখালেখি করার। চাচা ব্রুনো ফাল্লাচি তখন নামকরা সাংবাদিক। মাত্র ষোলো বছর বয়সে শুরু করেন সাংবাদিকতা। কিন্তু ভেতরে তার একটাই স্বপ্ন- লেখক হওয়া। সাংবাদিকতাকে লেখক হবার ভিত্তি হিসাবেই দেখেছিলেন তিনি। ক্রাইম বিটে কাজ করতে করতে একসময় যুদ্ধ কাভার করার দায়িত্ব পান তিনি। হাঙ্গেরি, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক যুদ্ধের খবর কাভার করেন তিনি। মারাত্মক আহত হন ১৯৬৮ সালে মেক্সিকোতে সংবাদ সংগ্রহের সময় তিনবার গুলি করা হয় তাঁকে। নিহত ভেবে পুলিশ চলে যায়। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তির ওরিয়ানা বেঁচে যান সে যাত্রায়।

তবে, সাংবাদিকতা জীবনে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন তিনি সাক্ষাৎকার নিয়ে। তাঁর নেয়া বহুল আলোচিত সাক্ষাৎকারের মধ্যে আছে হেনরি কিসিঞ্জার, ইরানের শাহ, আয়াতুল্লাহ খোমেনি, লেস ওয়ালেসা, জুলফিকার আলি ভুট্টো, ওমার গাদ্দাফি, ইয়াসির আরাফাত, ইন্দিরা গান্ধির সাক্ষাৎকারসহ আরো অনেক। তালিকা দেখেই মনে হচ্ছে, এসব সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য কী পরিমাণ খাটুনি করতে হয়েছে। তাঁর সাক্ষাৎকারে কখনোই কাউকে তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ওরিয়ানা ফাল্লাচি সরাসরি প্রশ্ন করেছেন- আপনার কি মনে হয় না যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয় ছিলো? কিসিঞ্জার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ একটা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ ছিলো। এবং তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর সাক্ষাৎকার ছিলো ওটা। ওরিয়ানা ফাল্লাচির সাক্ষাৎকারের ভিন্নতা হচ্ছে, সাক্ষাৎকারের পুরো নিয়ন্ত্রণ তিনি নিজের কাছে রাখতেন। আর সে কারণেই যেকোনো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন যে কারোর প্রতি। তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন- ধরুন, আমি একজন চিত্রশিল্পী, আপনার ছবি আঁকছি। তাহলে আপনাকে আমি ঠিক যেমন দেখি, সেরকমই আঁকাই কি উচিত হবে না?

ওরিয়ানা ফাল্লাচির প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *দ্য সেভেন সিনস অব হলিউড (১৯৫৬)*; *দ্য ইউজলেস সেক্স (১৯৬১)*; *পেনিলোপ অব ওয়ার (১৯৬২)*; *দ্য ইগোয়িস্টস (১৯৬৩)*; *ইফ দ্য সান ডাইজ (১৯৬৫)*; *নাথিং, অ্যান্ড সো বি ইট (১৯৬৯)*; *কুইল জিওর্নো সুলো লুনা (১৯৭০)*; *ইন্টারভিউ উইথ হিফি (১৯৭৪)*; *লেটার টু আ চাইল্ড নেভার বর্ন (১৯৭৫)*; *আ ম্যান (১৯৭৯)*; *ইনশাআল্লাহ (১৯৯০)*; *দ্য রেজ অ্যান্ড দ্য প্রাইড (২০০১)*; *দ্য ফোর্স অব রিজন (২০০৪)*; *ওরিয়ানা ফাল্লাচি ইন্টারভিউ হারসেফ (২০০৪)*। এর মধ্যে নাথিং, অ্যান্ড সো বি ইট (১৯৬৯)-এর জন্য ১৯৭১ সালে ব্যানকারেলা পুরস্কার; *আ ম্যান (১৯৭৯)*-এর জন্য একই সালে ভিরাজিও পুরস্কার এবং *ইনশাআল্লাহ (১৯৯০)*-এর জন্য ১৯৯৩ সালে তিনি প্রিন্স অ্যান্টিবস পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বের প্রায় একত্রিশটির মতো ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সম্ভবত কেবল *লেটার টু আ চাইল্ড নেভার বর্ন* অনূদিত হয়েছে *হাত বাড়িয়ে দাও*-নামে। এই বইটির জন্যই প্রকৃত অর্থে প্রথম সাহিত্য আলোচনায় আসেন ওরিয়ানা ফাল্লাচি। বইটিতে একজন গর্ভবতী মা তাঁর আসন্ন সন্তানের সঙ্গে নিজে নিজে কথা বলেন। গর্ভের সন্তান সামাজিকভাবে স্বীকৃত হবে না, কারণ সন্তানের প্রকৃত বাবার সঙ্গে গর্ভবতী মা'র সামাজিক কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলে-মেয়ে দুজন দুজনকে ভালোবাসে, কিন্তু বিয়ে হয়নি তাদের। তাই ছেলেটি চায়, মেয়েটা যেন গর্ভপাত করে ফেলে। কিন্তু মেয়েটি চায় না সেটা। শেষমেশ বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চা নষ্ট তথা অ্যাবরশনের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায়, ওরিয়ানা ফাল্লাচির মা'র একটি সন্তান তার সামনেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু, এ-বইয়ের ঘটনা ওরিয়ানা ফাল্লাচির নিজের। তিনি নিজেও একবার তিনমাসের জন্য মা হয়েছিলেন, পরে অ্যাবরশন হয়ে যায়। এমনকি বাস্তব সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুরুষ মানুষটির পরিচয়ও আমরা পাই তাঁর নিজের লেখা থেকেই। এর জন্য অবশ্য আরো চার বছর অপেক্ষা করতে হয় আমাদের। ১৯৭৯ সালে লেখা *আ ম্যান* বই পর্যন্ত।

আ ম্যান বইয়ের নায়ক এবং ওরিয়ানা ফাল্লাচির নিজের জীবনের নায়ক, তথা *লেটার টু আ চাইল্ড নেভার বর্ন* বইয়ের গর্ভের বাচ্চার বাবা একই ব্যক্তি। গ্রিক কবি এবং গ্রিসের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের এই বীরের নাম আলিকোস প্যানাগোলিস। মৃত্যু পর্যন্ত গ্রিসের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন এই যোদ্ধা। ১৯৬৭ সালে গ্রিসের স্বৈরশাসক জর্জ প্যাপাডোপোলাসকে গোপনে হত্যার জন্য প্যানাগোলিস অনেকগুলো বোমা পুঁতে রেখেছিলেন। পরিকল্পনায় ব্যর্থ হন তিনি, এবং ধরা পড়েন। প্যানাগোলিসকে জেলে পাঠানো হয়। পরবর্তী পাঁচ বছর তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু নৈতিকভাবে প্যানাগোলিস দুর্বল হননি একটুও। বশে আনতে না পেরে শাসকশ্রেণী তাঁকে একটা আলাদা বন্ধ-দুর্গে বন্দি করে রাখে। ১৯৭৩ সালে সাধারণ ক্ষমার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই বন্দি ছিলেন। মুক্তি পাবার দুদিন পর

প্যানাগোলিসের সাক্ষাৎকার নিতে যান ওরিয়ানা ফাল্লাচি। আর এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়েই প্রেমে পড়ে যান দুজন দুজন। পরবর্তী তিন বছর তাঁরা এক ছাদের নিচে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭৬ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্যানাগোলিসের মৃত্যু হয়, ধারণা করা হয়, এটা শাসকশ্রেণীর পরিকল্পিত হত্যা। প্যানাগোলিসের মৃত্যুর পর ওরিয়ানা ফাল্লাচি তাঁর *আ ম্যান* বই লিখতে শুরু করেন, ১৯৭৯-তে প্রকাশিত হয়, বইটি উৎসর্গ করা হয় প্যানাগোলিসকে।

১৯৮৩ সালে লেবাননে ইতালির সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্লটের উপর ভিত্তি করে ওরিয়ানা ফাল্লাচি তাঁর পরবর্তী বই *ইনশাআল্লাহ* রচনা করেন। বইটি তেমন সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়নি। অনেক রিভিউয়ার বইটির দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করলেও, ওরিয়ানা ফাল্লাচি নিজেই রিভিউয়ারদের তেমন গুরুত্ব দেন না। তিনি মনে করেন, রিভিউয়াররা সাধারণত নিচু মানের লেখক, এবং একই কারণে তারা কিছুটা হিংসুটেও। যাহোক, *আ ম্যান*-এর পর তাঁর *দ্য রেজ অ্যান্ড দ্য প্রাইড* (২০০১); *দ্য ফোর্স অব রিজন* (২০০৪)- বই দুটি প্রকাশিত হয়। দুটোই শুরু হয়েছে নাইন-ইলেভেনের টুইন টাওয়ারে বোমা হামলার পর, এবং অনেকটা সেটার উপর ভিত্তি করে। বই দুটো একটা সিরিজেরই অংশ। এবং দুটো বইয়েরই পুরোটা জুড়ে ইসলাম আর মুসলমানদের সমালোচনা করে লেখা। পৃথিবীর বহু দেশ থেকেই বই দুটির বিস্তার সমালোচনা করা হয়েছে। ইসলাম এবং মুসলিমদের হেয় করা হয়েছে উল্লেখ করে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি নিজের দেশ ইতালিতেও মামলা করা হয়েছে তাঁর নামে। অবশ্য, ইতালির সংবিধানে পরিষ্কার করে মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা আছে। ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাতের কথা বলে মত প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করা যায় না।

বই দুটির লক্ষ্যধিক কপি বিক্রি হয়েছে বলে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, এমনটা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। যে সময়টাতে লেখা হয়েছে, সে সময় ইসলাম, মুসলিম, জঙ্গিবাদের সমালোচনা করে লেখার কারণে বাজারে এর চাহিদা বেড়েছে। সাহিত্যের সমালোচকরা বলেছেন, বই দুটোর সাহিত্যমূল্য যেমন উঁচুমানের নয়, প্রকাশভঙ্গিও সাহিত্যিক ঘরানার নয়। টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনায় তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে ক্ষোভ মানুষ হত্যার নয়, মুসলমান আঘাত করেছে, এটাই তাঁর কাছে মুখ্য। কেবল বিগত হয়েছেন বলে ওরিয়ানা ফাল্লাচির প্রতি একপেশে না হয়ে আরো একটা দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার, রাজনীতি-সমাজনীতি এবং ধর্মের বিতর্কের বিশ্লেষণের জমিন কতোটা নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে তিনি করতে পেরেছিলেন। ইতালির ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের সহায়তা তিনি নিয়েছিলেন বলে জানা যায়, যেখানে তার বইয়ের লক্ষ্যধিক কপি বিক্রি হয়। এমনকি, গত বছরের ডিসেম্বরে মিলান শহরে তাঁকে *অ্যাস্ত্রোজিনো ডি'ওরো* নামক যে পুরস্কার দেয়া হয়, সেটার সঙ্গে ডানপন্থী গ্যাট্রিয়েল আলবার্তেনির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে নোবেল বিজয়ী *দারিও ফো*-ও সমালোচনা করেছেন। আরো একটি বিষয়, তিনি কেবল ইসলামি কটরপন্থীদের সমালোচনা করেছেন বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ-হাঙ্গামার জন্য। পোপ বেনেডিক্ট ১৬-র সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বলেছেন, এই পোপ-ই বিশ্বব্যাপী ইসলামীকরণের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করতে পারবে। আবার, তিনি বলেছেন- আমি নাস্তিক; কিন্তু একজন পোপ এবং একজন নাস্তিক একই বিষয় চিন্তা করলে বুঝতে হবে, ধর্মের বাইরেও মানবিক সত্য বলে কিছু একটা আছে। কিন্তু, তিনি নিজেই কি ধর্মের বাইরে এসে ভেবেছেন? তাহলে কেবল ইসলামি জঙ্গিবাদই সবকিছুর জন্য দায়ী- এটা বলা যায় না। তিনি সার্বিকভাবে সর্বধর্মীয় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বললে সেটা সমর্থনযোগ্য হতো। আর শুধু ইসলামীকরণ করলেই কি ইউরোপ ধ্বংস হবে? আবার যদি ইহুদিকরণ বা খ্রিস্টানীকরণ করা হয় তাহলে ইউরোপে শান্তি ফিরে আসবে? ওরিয়ানা ফাল্লাচি কি তবে ক্রুসেডের ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছিলেন? আবার, একজন নাস্তিক এবং একজন পোপ বা মোল্লা একই বিষয় ভাবলেই দুজনের সংগ্রামের পাটাতন এক হয় না (অবশ্য, ওরিয়ানা ফাল্লাচির ক্ষেত্রে ভিন্ন; ইসলাম বা মুসলিমদের বিষয়ে পোপ এবং তাঁর প্ল্যাটফর্ম একই। দুপক্ষই গোঁড়া ইসলাম-বিরোধী; ফলে আফগানিস্তান-ইরাকে মানুষ হত্যার প্রতিবাদ তাঁরা করেননি; করবেন না- এটাই স্বাভাবিক। কেননা, তাঁদের কাছে ওরা মানুষ নয়, মুসলিম। আরো একটা বিষয়, আমেরিকা তাঁর স্বপ্নের দেশ। সেখানেই জীবনের শেষভাগের বড় অংশ কাটিয়েছেন তিনি। নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন আমেরিকার এরকম বাড়ি তাঁর ছোটবেলার স্বপ্ন। আমেরিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যও তাঁর প্রিয় দেশ আমেরিকা। সেজন্য, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী হামলার বিরোধিতা তিনি হয়তো করতে পারেননি, আর ইসলামের গোঁড়া বিরোধিতাতো আছেই। যেমন, আফগানিস্তান-ইরাকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী হামলার বিরোধিতা করার বিষয়ে মানবতাবাদী নাস্তিক আর মোল্লাদের সিদ্ধান্ত এক- নির্বিচারে এসব অপ্রয়োজনীয় হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু, দুজনের প্ল্যাটফর্ম নিঃসন্দেহে এক নয়, এক হতে পারে না। মোল্লা বিরোধিতা করছে, মিছিল করছে, যুদ্ধ করছে মুসলমান মরছে বলে; আর মানবতাবাদী যুদ্ধ করছে মানুষ মরছে বলে।